গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে

জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ায় অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ, ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

মেহেরপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ায় নতুন ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছিল। তবে নির্মাণকাজ চলার একপর্যায়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসমাপ্ত ড্রেন ও খুঁড়ে রাখা গর্ত এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারের বসতবাড়ির সামনে তৈরি হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি। খোলা ড্রেন ও গর্তে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কার পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে এলাকায় নতুন ড্রেন নির্মাণের

কাজ শুরু হয়। কাজ চলার সময় রাস্তার পাশের মাটি খুঁড়ে ড্রেন তৈরি করা হয়। তবে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ওঠার পর পৌরসভা কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর আর কাজ শুরু না হওয়ায় ড্রেনটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। খুঁড়ে রাখা হয়েছে রাস্তার পাশের বড় অংশও।

সরেজমিনে দেখা যায়, মল্লিক পাড়ার সরু রাস্তার একপাশে নির্মাণাধীন ড্রেন। ড্রেনের পাড় তৈরি হলেও কিছু কিছু অংশের ওপর খোলা রয়েছে। কয়েকটি বাড়িতে যাতায়াতের জন্য ড্রেনের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে অস্থায়ীভাবে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার পাশের মাটি সরে যাওয়ায় চলাচলের জায়গাও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ অবস্থায় শিশু ও বয়স্কদের চলাচলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে রাতে খোলা ড্রেন ও গর্ত দেখা যায় না। সামান্য অসাবধানতায় যে কেউ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। একই সঙ্গে ড্রেনের ভেতর ও আশপাশে পানি জমে থাকায় মশার উপদ্রবও বেড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. সামসুল আলম বলেন, “দুই মাস ধরে ড্রেনের কাজ হচ্ছে। এই দুই মাস ধরে রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুই পাশে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় চারদিকে পানি জমে মশা হচ্ছে। আমরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছি না। এ বিষয়ে পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশ দিয়ে যেতে গেলে মাঝে মাঝে মাটি ভেঙে পড়ে। মোটরসাইকেল নিয়ে বের হতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম।”

হৃদয় হাসান বলেন, “রাস্তার দুই পাশে এভাবে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় বেহাল অবস্থা। ড্রেন করার পরও মাটি দিয়ে ভরাট করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি ড্রেন তৈরি হওয়ার আগেই সেটি ভেঙে যাচ্ছে। এই ড্রেন হওয়ার থেকে না হওয়াই ভালো ছিল আমাদের।”

মোহাম্মদ গৌশল আজম বলেন, “ড্রেনের কাজ শেষ না করে যত্রতত্র ফেলে রেখে গেছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শিশুরা খেলতে গিয়ে যেকোনো সময় গর্তে পড়ে যেতে পারে। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাই।”

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, “আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তার পাশে ড্রেনের কাজ হয়েছে। কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেছে। এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনি ছোট শিশু ও বয়স্ক সবাই দুর্ভোগের শিকার

হচ্ছেন।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ বন্ধ থাকলেও খুঁড়ে রাখা ড্রেন ও গর্ত নিরাপদ করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে তাদের।

ভুক্তভোগী বাসিন্দারা দ্রুত নির্মাণাধীন ড্রেনের কাজ শেষ করা অথবা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুঁড়ে রাখা অংশ নিরাপদভাবে বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়ে নেব। যতদিন ঠিকাদারের কাজ শেষ না হবে, ততদিন সমস্যার সমাধানে ড্রেনের আশপাশ মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।”

কাজটির ঠিকাদার মো. জুম্মান বলেন, “আর্থিক সমস্যার কারণে কাজটি বর্তমানে বন্ধ আছে। চলমান কাজ হওয়ায় ড্রেনের পাশে মাটি দেওয়া হয়নি। তবে আগামী সোম বা মঙ্গলবারের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।”

চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ

পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুর স্কুল মাঠে পানি জমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বৃষ্টির পানি জমে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

এলাকাবাসীর একমাত্র খেলার মাঠটি এই বিদ্যালয়ের মাঠ হওয়ায় স্কুল

শেষে গ্রামের শিশুরা এখানেই খেলাধুলা করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই মাঠে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, প্রতিদিন সকালে বাচ্চাদের ক্লাসে নেওয়া ও ছুটির সময় বের হওয়া দুটোই এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠজুড়ে পানি জমে থাকায় পায়ে কাদা লেগে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করছে। এতে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং রোগজীবাণু ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে।

এলাকার অভিভাবক ও স্থানীয়রা জানান, নতুন দরবেশপুরে খেলার জন্য এ মাঠটি ছাড়া আর কোনো উন্মুক্ত স্থান নেই। বাচ্চারা খেলতে না পারায় তারা হতাশ হয়ে পড়ছে।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী খন্দকার ওভি (১০) বলেন, সকালে আমরা স্কুলে আসি আর বিকেল ৪টায় ছুটি হয়। এর মাঝে টিফিন থাকে। খেলার মাঠ ভালো থাকলে তোমরা খেলা করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর পারছি না। যাতায়াতের সময়ও পানির ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। এর ফলে আমার অনেক সহপাঠী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তারা ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না। আমাদের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছা: খাইরুন নেছা বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছি। প্রতি বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ের মাঠ ও প্রাঙ্গণে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবাই চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

আমরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে আসছি। উপরমহল থেকেও আমাদের জানানো হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। তবুও আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি জোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে এলাকাবাসী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দ্রুত মাঠের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও মেরামত করা জরুরি। সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে মাঠটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে।
উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে মাঠের পানি নিষ্কাশন ও সংস্কারকাজ দ্রুত শুরু

করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকার শিশু-কিশোরদের বড় একটি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নানা ভোগান্তি

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকে বেড়েছে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানী বেড়েছে কয়েকগুণ। খাজনা পরিশোধের অনুমোদন না পেয়ে ভুমি মালিকদের ঘুরতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এতে একদিকে যেমন মানুষের হয়রানী বেড়েছে,অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। অফিসে সাংবাদিক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেন তহশিলদার আতিকুর রহমান।

সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নামজারী অনুমোদন নিতে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহেও পাচ্ছে না অনুমোদন বা নাগরিক সেবা।

নামজারি রিপোর্টের জন্য ২০০ টাকা, ও হোল্ডিং খুলতে নেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা,নামজারি করে দেওয়ার নামে নেওয়া হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ টাকা, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুর ১২ টার সময় অফিসে গেলে সাংবাদিক প্রবেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে যেতে হবে বললেন আতিকুর রহমান,অফিসের সব কাজ ফেলে রেখে তিনি মোবাইল ফোনে ব্যস্ত।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ধর্মচাকী গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে প্রবাস ফেরত সাইফুল ইসলাম জানান,আমি একটি হোল্ডিং খোলার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, এছাড়াও আমি বিবিধ ১৫১/১৩/১৫০ নামজারী বাতিল পৃর্বক সংশোধনের জন্য ১ বছর ধরে ভুমি অফিসে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ২৩/০৭/২০২৫ ইংরেজি তারিখে সহকারী কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সমস্ত কাগজপত্র দেখে উভয় পক্ষের শুনানি মোতাবেক নামজারী বাতিলের নির্দেশ দেন।

আদেশ পাওয়ার দুই মাস অতিবাহিত হলেও সহকারী ইউনিয়ন ভুমি কর্মকর্তা আতিকুর রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কর্মকর্তার নির্দেশ

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা হবে।

জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল

প্রায় দুই মাসের টানা বর্ষণে ডুবে গেছে মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির আউশ ও আমন ধান, কলা, মরিচ ও শীতকালীন সবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে মাছের ঘেরও। এতে যেমন দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে কৃষকদের।

কৃষকরা বলছেন, মাঠের পানি দ্রত না নামলে শুধু এবারের নয়, আগামী মৌসুমের ফসলও বুনতে পারবেনা কৃষকরা। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। সেই সাথে দেখা দিতে পারে জেলার খাদ্য ঘাটতি।”দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন সরকারি সহায়তার অপেক্ষায়।

মেহেরপুর জেলার সর্ব বৃহৎ ধলার মাঠ। যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু ফসল আর ফসল। সেই মাঠে এখন শুধুই পানি। পাকা ধানসহ বিভিন্ন ফসল এখন পানেও নিচে। দুই মাসের অধিক সময় ধরে অবিরাম বর্ষণ হয়েছে।

এতে জেলার বিভিন্ন স্থানের মতো গাংনী উপজেলার ধলার মাঠটিতে কোথাও হাটু পানি, কোমর পানি, আবার অনেক জায়গায় বুক পানি। এই পানি না গেলে কৃষক ফসলও তুলতে পরবেননা, আগামি মৌসুমেও ফসল বুনতেও না পারার আশংকা করছেন তারা।

মেহেরপুর জেলার সর্ববৃহত ধলার মাঠে গিয়ে স্বরেজমিনে দেখা গেছে-সবজিক্ষেতের অধিকাংশ গাছ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাকা ধান পানির নিচে ডুবে থাকায় আগাম কেটে ফেলতে হচ্ছে কৃষকদের। আর কলাক্ষেতে পানি আরও কিছুদিন থাকলে সেটিও মারা যাবে বলে আশঙ্কা। পানি জমে থাকায় ফসল তোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। যেখানে আগে গরু বা মহিষের

[redacted]

[redacted]

যেতে হয়। বর্ষায় জানাজায় ১০-১৫ জনের বেশি লোক অংশ নিতে পারে না।”

মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্থানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিও এই কাঁচা পথ। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও দেখা দেয় সীমাহীন দুর্ভোগ। বর্ষায় রাস্তাটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন মনে হয়, এই গ্রাম যেন পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।

আসাননগরের লোকজন বলেন, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত আসেন, নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে তারা আর ফিরেও তাকান না। স্থানীয় বাসিন্দা আজিম উদ্দিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “প্রতিবার আমরা আশায় থাকি এবার কিছু হবে। চেয়ারম্যানরা শুধু ভোটের সময় বলে, এরপর আর কেউ খোঁজও নেয় না।”

সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, শহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই কোনো পাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অথচ আশপাশের গ্রামগুলোতে একের পর এক রাস্তা পাকা হয়েছে। আসাননগর গ্রাম যেন উন্নয়ন মানচিত্রে ভুলে যাওয়া এক অঞ্চল।

স্থানীয় মেম্বার বা চেয়ারম্যানের কাছেও গেলে তারা বলে, বরাদ্দ নেই, অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ অপেক্ষার যেন কোনো শেষ নেই। গ্রামের মানুষ মনে করেন, একটি পাকা রাস্তাই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম ধাপ। তারাই চান—জরুরি ভিত্তিতে অন্তত মসজিদ, গোরস্থান ও ঈদগাহে যাওয়ার সড়কটি পাকা হোক।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দারা সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “আমরা রাস্তাই চাই, আর কিছু না। অন্তত একজন মানুষ মারা গেলে যেন ঠিকমতো জানাজা দেওয়া যায়, শিশুরা যেন ভিজে কাদা ডিঙিয়ে স্কুলে না যায়, আর অসুস্থ রোগী যেন কাঁধে নয়, ভ্যানে করে হাসপাতালে যেতে পারে।”

এই চরম দুর্ভোগ থেকে কখন মুক্তি মিলবে—সে প্রশ্নই এখন আসাননগরবাসীর হৃদয়জুড়ে।

ঝিনাইদহে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঝিনাইদহে সকাল থেকেই থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ এমন আবহাওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

বৃষ্টির কারণে শহরের ব্যস্ত সড়কগুলো হয়ে পড়েছে ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা ও রেইনকোট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তবে যানবাহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। সকালে শহরের পায়রা চত্বর এলাকায় দেখা যায়, অনেক রিকশাচালক অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন।

রিকশাচালক মিজানুর রহমান বলেন, “সকালে বের হইছি রিকশা নিয়ে, কিন্তু যাত্রী নাই। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাসে কেউ রাস্তায় বের হচ্ছে না। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকমতো ভাড়া পাইনি। বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না, তাই নামছি রাস্তায়।”

কাপড় বিক্রেতা মনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রকম আবহাওয়ায় ক্রেতা আসে না বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে দোকান খুলেও বসে থাকতে পারছি না। সকাল থেকে বিক্রি করতে পারিনি। কষ্টের মধ্যে আছি।”

চায়ের দোকানদার মানিক মিয়া বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে কেনা-বেচা খুবই কম। তবু দোকান খুলে বসে থাকি, যদি কিছু বেচা যায়।”

এদিকে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও পানি জমে গেছে। কাদা ও ভেজা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

তামাকে গিলছে ভর্তুকির সার

মেহেরপুরে তিব্র রাসায়নিক সার সংকট তৈরি হয়েছে। সার পেতে কৃষকদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। তবে এই সার সংকট তৈরি হয়েছে অতিমাত্রার তামাক চাষ ও অত্যাধিক ডিএডপি সার ব্যবহারের কারণে বলে জানিয়েছে কৃষি অধিদপ্তর ।

চলতি রবি মৌসুমে মেহেরপুরে ২৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমিতে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত বছরেও ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিলো। পরিবেশবান্ধব টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারে ভর্তুকি দেওয়া হলেও সেই সুবিধা নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়ায় তামাক চাষে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি ইউরিয়া সারের বর্তমান দাম ৪৮ টাকা, ডিএপি ৭০, টিএসপি ৫০, এমওপি ৬০ টাকা। ৫ টাকা দাম বৃদ্ধির পরও সরকারকে এখন প্রতি কেজি ইউরিয়ায় ২১ টাকা, ডিএপিতে ৪৯ টাকা, টিএসপিতে ২৩ টাকা ও এমওপিতে ৪০ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাসিন্দা কৃষক মোফাজ্জেল হোসেন । চলতি মৌসুমে তিনি ১১ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করছেন। মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, “আমি দুটি তামাক কোম্পানির তালিকাভুক্ত চাষি। প্রতি বিঘা জমিতে তামাক চাষের জন্য কোম্পানি থেকে আমাদের শুধুমাত্র রাসায়নিক সার হিসাবে সালফেট অব পটাশ (এস ও পি) ও বাজার থেকে অন্যান্য সার কেনার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার ১১ বিঘা জমিতে ১১০ বস্তা ডিএপি, ২২ বস্তা এমপি, ২২ বস্তা ইউরিয়া, ১১ বস্তা সালফেট প্রয়োজন পড়বে।

একই এলাকার কৃষক জহুরুল ইসলাম বলেন, আমার ৬ বিঘা জমিতে ফুল কপির চাষ করেছি। এই ৬ বিঘা জমিতে টিএসপি, ৬ বস্তা, ডিএপি ৬ বস্তা, এমপি ৩ বস্তা, ইউরিয়া ৩ বস্তা। কিন্তু চলতি মৌসুমে চাহিদা অনুযারী কোন সার পাওয়া যায়নি। সারের অভাবে ফুল কপি সময়মত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এবারে বড় আকারের লোকশানে পড়তে হবে।
গত বছরে নভেম্বর মাসে ডিএপির মোট বরাদ্দ ছিলো ১ হাজার ৯৯৩ মেট্রিকটন। চলতি মৌসুমে ১ হাজার ৫১৭ মেট্রিকটন।

জানতে চাইলে বিসিআইসির ডিলার মিরাজুল হক বলেন, কৃষকেরা সবজি চাষের নামে তামাক চাষে ডিএপি ব্যবহার করছে। এই কারণে ডিএপি সারের সংকট দেখা দিয়েছে। সবজি চাষে তামাক চাষের মত অতিরিক্ত সারের প্রয়োজন পড়ে না। কোন কৃষক কোন ধরনের ফসলের চাষ করছেন তা জানার উপায় থাকে না।

একই এলাকার কৃষক ছাদের আলী । তিনি বলেন, “ডিএপি সার হলো তামাকের প্রাণ। এটি ব্যবহার না করলে তামাকের ভালো ফলন পাওয়া যায় না।” তামাক কোম্পানিগুলো এর আগে সব রকমের সার দিতো। বর্তমানে শুধু মাত্র এস ও পি সার সরবারহ করে। এমওপি, ডিএপি সার এলাকার ডিলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। বর্তমানে বিশেষ করে ডি এপি সারের চরম সংকট তৈরি হয়েছে। একজন কৃষককে ৫০ কেজির বেশি ডিএপি সার দেওয়া হচ্ছে না। সারের যোগান দিকে কৃষকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ সামছুল আলম বলেন, মেহেরপুরে তামাকের চাষ হচ্ছে দির্ঘদিন থেকে। সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে তামাক চাষে কৃষকদের অনুৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু তামাক কোম্পানির নানান সুবিধার জন্য কৃষকদের মধ্যে তামাক চাষ কমানো সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে ডিএপি সারের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুন শুধুমাত্র তামাক চাষের কারণে।

সবজি,ধান,পাট, গম,পেঁয়াজ, রসুন, আলু চাষে নির্দিষ্ট পরিমানে সার ব্যবহার হয়। অন্যদিকে শুধুমাত্র তামাক চাষে বিঘা প্রতি ৫০০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারের প্রবনতা তৈরি হয়েছে কৃষকদের মাঝে। একারণে অন্যান্য ফসলের জন্য সার পাচ্ছেন না কৃষকেরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বিদেশি তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি বলেন, তামাক কোম্পানি কৃষকদের তামাক চাষে সুবিধবার জন্য এসওপি সার বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবারহ করে। ডিএপি, এমওপি, ইউরিয়া, জিপসাম সার বাইরে থেকে কেনার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয় ।

সরকারি সার সুপারিশ নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, এক বিঘা ফুল কপির জমিতে ২৯ কেজি ইউরিয়া, ৩৩ কেজি টিএসপি, ১২ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে একই জমিতে যদি তামাক চাষ করা হয় সেখানে কৃষকেরা বিঘা প্রতি জমিতে শুধুমাত্র ডিএপি ৫০০ কেজি ব্যবহার করছেন। ইউরিয়া ৫০ কেজি, এমওপি ৫০ কেজি ব্যবহার করতে হচ্ছে।
কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারি ভর্তুকির সার চলে যাচ্ছে তামাক চাষে। অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ ফষলের জন্য সার মিলছে না বাজারে। সরকারি ডিলারদের বরাদ্দের চেয়ে বেশি পরিমানে সারের প্রয়োজন পড়ছে

কী পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সেই পরামর্শ তামাক কোম্পানির কৃষিবিদরা দিয়ে থাকেন।” তামাক চাষের কারণে সবজি সহ অন্যান্য ফসলের সার পেতে কৃষকদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছ “।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরে উপপরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, “ তামাক চাষ কৃষি জমি ও পরিবেশের জন্য মারাত্তক হুমকি। তামাক চাষে কৃষকদের নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়।